International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.01-11
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.1-11

সেলিম আল দীন - একজন নাট্যকার, একজন রাজনীতিক

ড. অমিতাভ কাঞ্জিলাল
বিভাগীয় প্রধান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিলিগুড়ি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Salim Al Din, the versatile playwright and thespian, who remained to be the founding Director of the Dramatic Department at Jahangirnagar University in Bangladesh and the creative director of Dhaka Theatre, has left remarkable influence in modern Bengali theatre through his uniqueness of methodology and visionary experimentation in the development of dramatic productions responding to the contemporary Global and National issues during his time. In his path-breaking effort to establish Bengal's own theatrical approach, he surpassed the Colonial legacy within the limits of contemporary native theatre strictly confined to a minority of citizen-audience living in facilitated cities and towns. While enmixing the traditional folk-artistry in their original form with the greater perspectives and crisis of civilization, he was keen to accommodate the contours of folk mythology, music and oral into his scripts that went beyond the limits of any particular form of creative literary writing and did so in abandon. As a vivid dramaturge, Selim Al Din has been instrumental in spreading the Village Theatre Movement with his colleague Nasir Uddin Yusuf at the remotest corners of Bangladesh. His creative width spans to globality, while the depth was rooted to local rural life. His sensitivity towards the agony of the commons in a struggle-earned independent nation is profoundly reflected through his cultural and academic activism. The present article reviews the worldview of the author and the repercussions of socio-political and cultural turbulence he experienced in his motherland, reflected in his creative writings.

Key-Words: Post-Colonial Literature; Folk Art; Aesthetics; Rural-Social Ecology; Subaltern Performance; Post-Soviet World Politics; Consumerism.

বাংলায় নাটক রচনা এবং তার প্রয়োগ নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হয়ে থাকবেন সেলিম আল দীন। বাংলা নাটকের নান্দনিকতা এবং প্রকাশভঙ্গির রাজনীতি বিষয়ে তাঁর সময়ানুচারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুদুরপ্রসারি প্রভাব রেখে গেছে বিদ্যোৎসাহী ও প্রদর্শনকারী-শিল্পীমহলে। বাংলার লোক-প্রান্তর থেকে অনামী মানুষের রোদ-বৃষ্টি মাখা জীবনের রূপ-রস-গন্ধ'কে শতবর্ণের বর্ণিল সমারোহে তাঁর নাট্যসাহিত্যের সম্ভারে ও রীতিতে বিবৃত করেছেন যেমন, তেমনি প্রকৃতি ও নিয়তির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে দ্বান্দিক সম্পর্কে দীর্ণ প্রান্তজনের শীর্ণকায় শরীরে সাহস, আস্থা আর সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের নিরূপিত বয়ানে সেলিম আল দীনের নাটকগুলি বিপন্ন সময়ের অন্তরে শ্রেণী-রাজনীতির অনাগত কিন্তু অনিবার্য পরিনামের কথা সমৃদ্ধ রূপক ও উপমায় তুলে ধরেছে।

যথার্থ বিপ্লবীর মতোই ঔপনিবেশিক প্রভুদের প্রচলিত নাটকের বহুলচর্চিত আঙ্গিকের অচলায়তন ভেঙে প্রাচ্য ভূখণ্ডের নাট্য-নান্দনিকতার ধারাবাহিকতাকে তিনি তুলে এনেছেন উপমহাদেশের উত্তর-ঔপনিবেশিক নাট্যশৈলীতে আঙ্গিক-অবলুপ্তির কৌশলে। তাঁর নাটক একাধারে একটি গীতিবিবৃতি, একটি কাব্য-আখ্যান কিম্বা একটি উপন্যাসের চরিত্র অর্জন করে মহিমান্বিত হয়েছে। তাঁর নাট্যরচনাশৈলীতে কথোপকথন বা সংলাপ-সংবদলের পাশাপাশি অন্তর্কথন বা সাব-টেক্সট সমধিক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রচনাশৈলীর বৈপ্লবিক অনন্যতা বিশ্বসাহিত্যে সেলিম আল দীনের নাটক'কে এক বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। উপমহাদেশের হাজার বছরের নাট্য-ঐতিহ্যকে আধুনিক মননশীলতার সাথে সংশ্লেষিত করে সেলিম আল দীন যে নাট্যভাষার জন্ম দিয়েছেন তা শুধু বিস্ময়কর নয়, যুগান্তকারীও বটে। নাটকের নামে ইন্দ্রজাল বা মায়া তৈরির প্রবণতাকে পাশ্চাত্যের নাট্যশৈলীর অন্যতম বিভ্রান্তিকর প্রেক্ষিত বলে তিনি বিবেচনা করতেন। বরং উপমহাদেশের সহস্রাব্দ-প্রাচীণ নাট্যশৈলীতে বিশ্বাস ও অনুমানকে যোগ্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবার রীতি তথা পাদটীকামূলক ব্যাখ্যাসহযোগে প্রদর্শন-সমারোহকে তিনি তার নাট্যসাহিত্যে অন্তর্ভাষের আঙ্গিকে পুণঃস্থাপিত করেছেন।

১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট নোয়াখালীর ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার সেনেরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের বাংলাভাষার আধুনিক পর্বের এই বিস্ময়-নাট্যপ্রতিভা। বাবা মফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং মা ফিরোজা খাতুন। ১৯৬৪ সালে সেনেরখিল মঙ্গলকান্দি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি উত্তীর্ণ হন, ১৯৬৬ সালে ফেনী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন, ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন কিন্তু দ্বিতীয়বর্ষ পর্যন্ত পড়বার পর রাজনৈতিক কারণে তাঁকে টাঙ্গাইলের করটিয়া সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হয়, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে 'মধ্যযুগের বাংলা নাটক' শীর্ষক গবেষণাপত্র জমা করে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল কপি রাইটার হিসেবে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রভাষকরূপে যোগদান করেন। এই বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করবার পর ১৯৮৬ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যতত্ত্ব বিভাগ গঠন করে ওই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ও অধ্যাপনা করেছেন। রচয়িতা হিসেবে সেলিম আল দীন বিদ্যোৎসাহীজনের আলোচ্য হয়ে ওঠেন কবি আহসান হাবীব সম্পাদিত দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে "নিগ্রো সাহিত্য" শীর্ষক একটি বাংলা প্রবন্ধ রচনা করে। ১৯৬৯ সালে তাঁর লেখা নাটক প্রথমবার প্রচারিত হয় রেডিওতে। বেতার নাটকটির নাম ছিল "বিপরীত তমসায়"। ১৯৭০ সালে টেলিভিশনে আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় প্রথমবার প্রদর্শিত হয় তার রচিত নাটক "লিব্রিয়াম"। নাটকটি পরবর্তীতে "ঘুম নেই" শিরোনামে প্রযোজিত হয়েছে। 'রক্তের আঙুরলতা', 'অশ্রুত গান্ধার', 'গ্রন্থিকগণ কহে', 'ভাঙনের শব্দ শুনি', 'অনৃত রাত্রি', 'ছায়াশিকারী', 'রঙের মানুষ', 'নকশীপাড়ের মানুষেরা', 'প্রত্নারী', 'হীরাফুল'সহ আরও অনেক জনপ্রিয় টিভি নাটকের রচয়িতা তিনি। ১৯৭২ সালে তাঁর লেখা প্রথম মঞ্চনাটক "সর্প বিষয়ক গল্প" আমিরুল হক চৌধুরীর নির্দেশনায় 'বহুবচন' কর্তৃক প্রযোজিত হয়। ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে গড়ে তোলেন গানের দল 'কহনকথা'।

একাধারে নাট্যকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্বের অধ্যাপক এই দ্বৈত-পরিচিতির বাইরেও সেলিম আল দীন একজন জননন্দিত নাট্যগবেষক, নাট্যসংগঠক, নাট্যনির্দেশক ও শিল্পতাত্ত্বিক। বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশিল্প পরিসরে বিশ্ব নাট্যধারার মেলবন্ধন গড়ে তুলতে ১৯৮১-৮২ সালে আরেক বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক নাসীরউদ্দিন ইউসুফের সাথে দেশব্যাপী গড়ে তোলেন গ্রাম থিয়েটার আন্দোলন। এই দুই নাট্যব্যক্তিত্বের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা পায় 'ঢাকা থিয়েটার', যা পরবর্তীতে সেলিম আল দীনের নিরীক্ষামূলক নাট্যরচনা এবং বিশেষ শিল্পদৃষ্টি প্রতিষ্ঠার আঁতুরঘর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে সেলিম আল দীনের নাটকের মঞ্চায়ন মানেই নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর চিত্রনাট্য। দীর্ঘদিনের সহকর্মী না হলে তিনিও হয়তো সাহস করতেন না সেলিম আল দীনের রচনায় হাত দেয়ার। বাংলা নাটকের গতিপথ পাল্টে দেওয়া ভগীরথ নাট্যকার সেলিম আল দীনের "জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন", "বাসন", "মুনতাসির", "শকুন্তলা", "কীত্তনখোলা", "কেরামতমঙ্গল", "যৈবতী কন্যার মন", "চাকা", "হাতহদাই", "ধাবমান", "বনপাংশুল" ইত্যাদি কালক্রমে মঞ্চায়িত জনপ্রিয় প্রযোজনা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে থাকে।

পাশাপাশি বাংলা নাটকের হাজার বছরের ঐতিহ্য ও আঙ্গিক নির্মাণের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন "মধ্যযুগের বাংলা নাট্য" শীর্ষক আকরগ্রন্থ, বাংলা ভাষার একমাত্র নাট্যবিষয়ক কোষগ্রন্থ "বাংলা নাট্যকোষ সংগ্রহ" প্রণীত হয়েছে তাঁরই হাতে, এছাড়াও নিয়মিত সম্পাদনা করেছেন নাট্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা "থিয়েটার স্টাডিজ", কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন - যার মধ্যে "কবি ও তিমি" উল্লেখযোগ্য, প্রকাশ করেছেন উপন্যাস "অমৃত উপাখ্যান"। সাহিত্যের বিবিধ শাখায় অবাধ গতিবিধি এবং অসামান্য অবদানের জন্য সেলিম আল দীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, নান্দীকার পুরস্কার (কলকাতা), শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাট্যকার, খালেকদাদ সাহিত্য সম্মান, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কারসহ বিবিধ সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ২০০৮ সালের ১৪ই জানুয়ারি বাংলা নাটকের এই যুগপুরুষ' প্রয়াত হয়েছেন।

ঢাকা থিয়েটার তার অগ্র-লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছিল এক হৃদয়স্পর্শী চেতনার কথা - "বাংলাদেশ একটি সংগ্রামক্ষুব্ধ অকুতোভয় জনপদের নাম। যুদ্ধ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে এই জনপদ সমুন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্জ্বলিত করেছে তার সামুদ্রিক দুই চোখে। এই দেশ, তার ইতিহাস, সংগ্রাম, সংস্কৃতি, সবকিছুকে আমরা সম্মান করি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলার কূলে কূলে নামহীন গোত্রহীন মানুষের সংগ্রামী জীবন আমাদের নাটকের বিষয়বস্তু !" - এ যেন সেলিম আল দীনের নাট্যদর্শনের অন্যতম আভিমুখ, তার রচনাবলীর গভীর প্রতিপাদ্য। ঢাকা থিয়েটারের এই ঘোষণা আর সেলিম আল দীনের আজীবন নাট্যকৃতির বহুলাংশের বিষয়বস্তু, প্রেক্ষাপট, বিন্যাস অনেকাংশেই সমার্থক-সমান্তরাল, যার অন্তর্মূলে আছে এক সচেতন রাজনীতি - প্রান্তজনের স্বর'কে ক্ষমতার কেন্দ্রে (রাজধানীতে) প্রতিধ্বনিত করা, প্রতিফলিত করা সেই প্রান্তিক জনপদগুলির স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গ, আশা আর আশাহননের জীবন্ত ছবি। প্রান্ত এবং কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্যকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আতশকাঁচের নীচে এনে শ্রেণী-রাজনীতির উপজীব্যকে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলেন সেলিম আল দীন এবং তার ঢাকা থিয়েটার। কিন্তু তাঁর স্বদেশে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট' আন্দোলনের সামান্য শক্তি তথা অসংগঠিত অবয়ব তাঁর এই চেতনাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ময়দানে নিয়ে যেতে ভারবহনে সক্ষম ছিল না।

"করিম বাওয়ালীর শত্রু" অথবা মূল "মুখ দেখা" নাটকে নাট্যকার সেলিম আল দীন প্রথমবার প্রান্তজনের জীবন সংগ্রামকে মঞ্চের উপজীব্য করে তুললেন। বাওয়ালি সম্প্রদায় মৌমাছির চাক থেকে মধুসংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর লালসায় মাইলের পর মাইল জঙ্গল যখন ফাঁকা হয়ে যায় তখন বাওয়ালীরদের উপার্জন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিবেশের সাথে এই প্রান্তিক মানুষদের যে বাস্তুরীতিগত যোগাযোগ তা বিপন্ন হয়ে পড়লে মরমী নাট্যকারের কলম তাকে তুলে নিয়ে আসে জনসমক্ষে।

"আতর আলীদের নীলাভ পাট" নাটকে বাংলার কৃষিজনপদের পাট চাষীদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-কষ্ট, বিশ্বাস-সংস্কারের পাশাপাশি মহাজনদের শোষণের কথা উঠে আসে। যার দ্বান্দ্বিক বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ এবং দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের দুর্মর শক্তিকে রঙ্গ মঞ্চের আলোয় অমর করে রাখেন নাট্যকার।

"হরগজ" নাটকে ঘূর্ণি-বিধ্বস্ত গ্রাম্যজনপদের এলোমেলো চিত্র যে হাহাকারকে ফুটিয়ে তোলে তার বাস্তব সূত্র নিহিত আছে ১৯৮৯সালে মানিকগঞ্জের হরগজ গ্রামে এক বিধ্বংসী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায়। প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের শেষে উদ্ধারকারীরা ত্রাণকার্যর জন্য সেখানে পৌঁছলে দেখতে পান বৃক্ষের ছিন্ন শাখা, মৃত পাখি, পশ্বাদিসহ হত-আহত মানুষের দেহ ও খন্ড। প্রকৃতির আদিম ধ্বংসাত্মক রূপের সামনে বিশ শতকের অন্তিম চরণের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও বিত্ত-বৈষম্যের কারণে প্রান্তিকজনের নিরাপত্তাহীন অসহায়ত্ব, সুরক্ষাবিহীন আশ্রয়ক্ষতি আর চরম দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা 'হরগজ'-এর মত বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামীণ জনপদের দৈন্যদশার প্রতীকী উপস্থাপনা শহুরে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের নিরাপদ সুরক্ষিত জীবনযাত্রার মর্মে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন বিশ্ব রাজনীতিতে যে অভূতপূর্ব আশঙ্কার বাতাবরণ সৃষ্টি করে তা থেকে জন্ম নেয় ভারসাম্যহীন এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। অনির্ণীত অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয় বিশ্বের ভবিষ্যতকে। মানবসভ্যতা যেন এক ভয়াবহ তান্ডবের সম্মুখীন হয়, যার হিংস্র আঘাতে ছয়শোবছরের সকল মূল্যবোধ নিমেষে ছিন্নভিন্ন, অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ভেঙ্গে পড়ে বার্লিনের প্রাচীর, ভাঙ্গা হয় মহামতি লেনিনের ভাস্কর্য - আর এইসব প্রত্যক্ষ করতে করতে নাট্যকার সেলিম আল দীন তৈরী করেন "হরগজ" নাটকটি।

"কীত্তনখোলা"য় একটি গ্রাম্যমেলাকে কেন্দ্র করে হতদরিদ্র (সোনাই, বছির, ছমির, কাশেমালী), আপেরার নট-নটী (ছায়ারঞ্জন, বনশ্রী, রবিদাস), লাউয়া সম্প্রদায়ের শ্রমজীবিদের (ডালিমন, রুস্তম) আবহমান নৃকূলগত ঐতিহ্য এবং যাপিত জীবনের অসাধারণ গল্পভাষ্য উঠে আসে। সেখানে ইদু কনট্রাক্টরদের জমির লোভ কিভাবে বিভিন্ন অন্ত্যজ ও প্রান্তিক জনের জমি-জংগলের অধিকার লোপাট করে দেশান্তরী ও পেশান্তরী করেছে তারই নিরূপম বর্ণনা আছে, আছে শামছল বয়াতির মুখে এই বাংলায় মধ্যযুগের সমৃদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতির কথকতা। ছিন্নমূলকে যেন শিকড়ের ঘ্রাণ দিতে চান শামছল বয়াতি। অথচ জীবন, জীবিকা বদলে বদলে যেতে থাকা মানুষগুলোর কারো হিসেব মেলে প্রতিশোধ আদায় করে, কেউ বা পালিয়ে বেড়ায় নিজের অতীত থেকে।

"কেরামতমঙ্গল"-এ মহাকাব্যিক আয়োজনে গ্রাম বাংলার সরল সাদাসিধে মানুষগুলির সামুহিক সংকট বা তার থেকে উত্তরিত হবার প্রয়াস চিত্রিত হয়েছে। নাটকে অনেক চরিত্রের সমাহার, এগারোটি আলাদা আলাদা খন্ডে মূল কাহিনীর বিস্তার, তার অন্তরে আবার বেশ কিছু স্বল্প-কাহিনী রাখা আছে অথচ ভিন্ন ভিন্ন

স্থান, সময় এবং ঘটনার মধ্যে যোগসুত্র গড়ে নাটকের গঠনগত ঐক্য বজায় রেখেছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। ভারত-বিভাজনের কিছুকাল আগে থেকে আরম্ভ করে পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিভ্রান্ত সমাজব্যবস্থা তথা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত অনিশ্চিত জীবনযাত্রার মধ্যে বাংলার গ্রাম জনপদের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর এবং নানা জাতের মানুষের সুখ-দুঃখের বারামাস্যাকে নিয়ে এই নাটকের কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে। সেখানে কোথাও সাম্প্রদায়িকতার নরকযন্ত্রণা, কোথাও উদ্বাস্তু মানুষের সীমাহীন কষ্ট, কোথাও সামন্তবাদের অমানবিক শোষণ, কোথাও প্রকৃতির ভয়াল রোষের শিকার মানবতা, কোথাও প্রতিবাদীদের উপর নেমে আসা দমন-পীড়ন, কোথাও জেলের ভেতর অত্যাচারের নির্মম পেষণ, কোথাও ধার্মিক মিশনারীদের কৌশলী উৎপাত, কোথাও মৌলবাদের উস্কানি, কোথাও নিরাশা আর হতাশার হাহাকার, কোথাও অর্থহীন স্বাধীনতার ব্যভিচার - এক দোজখ (নরক) থেকে আরেক দোজখে ক্লান্তিহীন পর্যটকের মতো ঘুরে বেড়ায় সর্বহারা কেরামত আর বোধি লাভ করে শিকল ছেঁড়ার সঙ্কল্পে।

"চাকা" নাটকে একটি বেওয়ারিশ লাশের সাথে দুই গাড়োয়ানের গড়ে ওঠা আত্মিক সম্পর্ক এবং তারপর তার শেষকৃত্য সম্পাদনের মাধ্যমে প্রান্তজনের মানবিকতার যে আশাব্যঞ্জক মায়াছবি জেগে ওঠে তার অন্তরে আছে নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী শাসকের পতন ও গণতন্ত্রের বিজয়ের প্রেক্ষাপট, যে গণঅভ্যুত্থানে অনেক যুবক শহীদের মৃত্যুবরণ করে কিন্তু তাদের সকলের সাকিন-ঠিকানা সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে তাদের বেওয়ারিশ লাশের দাফন-কাফন পর্যন্ত ঠিকঠাক হয়নি। সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণি-সংগ্রামের যে চিত্র বর্তমান পৃথিবীতে চলমান তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি নাট্যকারের। বাস্তবতা ও পুরাণের কথকতার ভঙ্গীতে কাহিনী এগিয়ে চলে গ্রাম্যপথ বেয়ে। লাশ দেখে বিভ্রান্ত জনতার ভীড় বাড়ে। কার লাশ, কিভাবে মারা গেল? - এ সব প্রশ্ন ঘিরে ধরে গাড়োয়ানকে। সরকারী হুকুমে লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শুনে নানাজন ইতিউতি নানা মন্তব্য করে। কেউ কেউ আবার নিজের জানা-শোনা বেওয়ারিশ লাশ দেখার অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে যেন নতুন কাহিনির জন্ম দেয়।

উপকূলীয় বঙ্গদেশে বসবাসকারী মানুষের মৌখিক শব্দ "হাত হদাই" - যার আক্ষরিক অর্থ সাত-সওদা বা সপ্ত-বাণিজ্য। যদিও এ নাটক কোন বাণিজ্যকাহিনী নয়, সমুদ্র উপকূলবর্তী প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের বাস্তব আলেখ্য। বৃদ্ধ নাবিক আনার ভান্ডারী যৌবনে পৃথিবীর নানা বন্দরে ঘুরেছেন, সেই জন্য সবসময় উৎফুল্ল মেজাজে থাকতে চাইতেন। কিন্তু বয়স তাঁকে পরলোকের চিন্তা ও মৃত্যুভাবনায় তাড়িত করে, এ সময় তাকে ঘিরে সক্রিয় হয় ধর্মব্যবসায়ী মছলন শা। আনার ভান্ডারী মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে বলে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে রাখতে চায়, কিন্তু কবর-খননকারীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে পুনরাবিষ্কার করে জীবন-তৃষ্ণা, তাই বার্ধক্যেও নিজের শ্যালিকাকে বিয়ে করে নবজীবনের অভিসারে আরেকবার ঘর বাঁধার কথা ভাবে। ধর্ম-গেরোর ফাঁসকে কাটিয়ে মুক্ত জীবনের ছন্দে সামিল হন বহুদর্শী নাবিকটি।"হাত হদাই" নাটকে বিভাজন রীতি জোয়ার ভাঁটার সাথে সংশ্লিষ্ট রেখে করা হয়েছে। মোট একুশটি জোয়ার এবং উনিশটি ভাঁটায় এ নাটকের কাহিনী বিস্তৃত।

"যৈবতী কন্যার মন" নাটকে দুজন মৃত নারীর আখ্যান' তুলে ধরেছেন নাট্যকার। কালিন্দী মধ্যযুগের চরিত্র, আর পরী আধুনিক সমাজ বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের আত্মকথনে বাঙালি সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমার্থক তাইই ব্যক্ত হয়েছে সেলিম আল

দীনের নাট্যদর্পণে অসামান্য নৈপুণ্যের সাথে বিধৃত বৃত্যান্তে। এই নাটকের বহমান আখ্যান সোমেশ্বরী পাড়ের ধানকুঁড়া গ্রাম থেকে মেঘনার ঢেউয়ে দোলায়িত হয়ে বরগুনা, পটুয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চল ধরে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। এই ভূগোলের পার্শ্বস্থ জনপদগুলির বিত্তশালী মহাজন, ন্যায়শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ, শরীয়ত ও মারফতপন্থী মুসলমান, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, রাখাইন নৃ-গোষ্ঠী, সামন্ত চাকলাদার, নিকারী, ডোম, পালাকার, পুতুলমাস্টার, যাত্রাশিল্পী, ঘুড়ি বিক্রেতা, মাঝি, শুয়োরপালক ইত্যাদি নানা পেশার, নানা শ্রেণী আর গোষ্ঠীর মানুষের জীবনশৈলীর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকটির কাহিনী কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রে পরিধি অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে অবলীলায়। সেলিম আল দীনের অধিকাংশ রচনায় নদীমাতৃক বাংলাদেশের জলজ ভূপ্রকৃতি প্রাণবন্ত স্বরূপে চিত্রায়িত হয়েছে। এই নাটকেও নাট্যকার বাংলার বাস্তুজীবনের সমগ্রতার সাথে কল্পজগতের নিরন্তর নান্দনিক সংযোগকে নাট্যে ধারনের জন্য নাটকে বাঁশি, হুলোবিড়াল, পুতুল, জল, জলের ভেতরে ছায়া, মাছ, লতা, জলজ উদ্ভিদকে পর্যন্ত চরিত্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। পরী চরিত্রটি কথা বলে চলে প্রকৃতির সাথে - পুকুরের শান্ত জল, পুকুরপাড়ের ঝোপঝাড়, হুলোবেড়াল, লঞ্চে করে আসর থেকে অন্য আসরে যাবার পথে নদীর জলের সাথে তার নিমগ্ন আলাপচারিতা চলতেই থাকে।এ যেন বাংলার নিজস্ব ফ্যান্টাসী।

"বনপাংশুল" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো 'বনের পাঁচালী'। এ নাটকে লুপ্তপ্রায় মান্দাই বা কোচ উপজাতির বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকাহিনীতে সুকি নাম্নী এক ধর্ষিতা নারীর গর্ভে বেড়ে ওঠা ভ্রুণেই মান্দাই সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষাকে জেগে থাকে। সেলিম আল দীন এই নাটকে বিস্তৃত করেছেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুনরায় জেগে ওঠার স্বপ্নে উজ্জ্বল, সকল আগ্রাসনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে নবজীবনের কামনায় সমুদ্ধত প্রান্তিক মানুষদের চরিতকথা।

সেলিম আল দীনের রচয়িতা জীবনের এই পর্বের নাট্যপরিক্রমা যেন স্বদেশের জনজাতি সম্পদের শেকড়ের এক গহীন অনুসন্ধানী প্রক্রিয়া। নাট্যকার একদিকে বিষয়ে চেতনায় অন্যদিকে নির্মাণের আঙ্গিকে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রান্তজনের মুখের ভাষাকে ও লোক কাহিনীর থেকে উৎসারিত আখ্যানকে তাঁর নাট্যসাহিত্যের অবলম্বন হিসেবে সাজিয়ে তুলেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। সেইসঙ্গে গল্প বলার উদ্ভাবনী দৃষ্টিকোণ উত্তর-ঔপনিবেশিক নাট্যশৈলীর অন্যতম অগ্রণী নাটককার হিসেবে তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে।

সেলিম আল দীনের নাট্যকার জীবনের প্রথম পর্বে লেখা নাটকগুলিতে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সংকট, রাজনৈতিক সমস্যার রূপক-বিবরণী খুঁজে পাওয়া যায় হতাশার খন্ড-চিত্র-কোলাজ হয়ে। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বক্তব্যের আদলে গড়ে ওঠা সংলাপের মাধ্যমে নির্মিত এই পর্বের নাটকগুলি অ্যাজিটপ্রপ নাট্যশৈলীর ভাবধারাকে অনুসরণ করে কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিস্তৃত আলোচনার চল রয়েছে।

"জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন" নাটকে ফকিরের কান্না, বেকারের চিল-চিৎকার, ভুখা মানুষের হাহাকারী মিছিল মিলেমিশে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে সম্পদ-বৈষম্যের চিত্রকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। নাটকের চরিত্র বলে ওঠে, "আজকাল জিনিসের দাম শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হয় - কিন্তু ওই যে, কোন জিনিস কিনলেন - সঙ্গে পেলেন একতারা বেলুন, বিনি পয়সায়"। কিংবা অন্যত্র, ভিয়েতনামের জনগণ মার্কিন সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যখন লড়াই করছিল তার প্রসঙ্গ নিয়ে এসে নাট্যকার সংলাপ রচনা

করেছেন, "চমৎকার হবে। ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ নিহতের সংখ্যা একশ এবং তারপরেই রেডক্রস রিলিফ! হা হা হা! ... মিস ওয়ার্ল্ড কোন ভিয়েতনামে যায়? গণহত্যার যোগান দিতে?"

"সর্প বিষয়ক গল্প" নাটকে বাংলাদেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে সংশয় উদ্রেককারি বক্তব্য রাখা আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যখন সপরিবারে হত্যা করা হলো এবং তার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ভাবনার পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা হলো, তখন থেকেই সাড়ে তিন বছরের সরকার নানা জটিলতা এবং সংকটের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হতে থাকলো - এই পরিস্থিতিতে সেলিম আল দীন লিখলেন সমসাময়িক রাজনীতির পর্যালোচনাধর্মী এই নাটক। নাটকের অন্যতম চরিত্র ফরহাদের স্ত্রীর মুখে নাট্যকার সংলাপ দিলেন – "এখনকার লোকগুলো যে কী সে আমার দেখা গেছে! লোকটা যখন মিছিলে যেত - পেছনে হাজার হাজার লোক - অথচ জানাযায় তো ছয়জনের বেশি যায়নি!" একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর যন্ত্রণা যাদের বারবার বিদ্ধ করছিল সেলিম আল দীন তাদের কথাই এই নাটকে তুলে ধরেছেন এবং এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্বকে নাটকে প্রকাশিত করেছেন।

"এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা" নাটকে নাট্যকার ব্যবসায়ীমহলের নৈতিক অধঃপতনের বাস্তবকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে কালোবাজারি, খাদ্য ও শিশুভোগ্যে ভেজাল, সন্ত্রাসীদের বোমা তৈরীর মত নিত্যকার সংবাদপত্রের ঘটনাপ্রবাহকে রিপোর্টাজের মত বিবৃত করেছেন। নাটকের একটি চরিত্র ফারুকের মুখে সংলাপ আছে, "আর কী! বাংলাদেশের সব জিনিসই এখন আন্ডার গ্রাউন্ডে। সারাদিন রোদে-ঘামে শাওয়ার করে তবে মিলছে"। নাটকে একটা বড় বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য একটি দল বোমার নানা উপকরণ যোগাড় করে, কিন্তু ভেজাল এক্সপ্লোসিভের কারণে বোমা বিস্ফোরিত হয় না! সেই হতাশায় ফারুক বলে, "অসহায় প্রলেতারিয়েত ! কে, কবে ফিরে তাকিয়েছে?"

"নীল শয়তান তাহিতি" নাটকে জনৈক স্বপ্নবিলাসী আমলার চিরায়ত বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয়-জীবন আর অন্যদিকে সমুদ্র ভ্রমণ, বইপড়া আর আড্ডার প্রবণতায় উন্মুক্ত জীবনের ছন্দকে অনুভব করার চেষ্টা - এই দুই সত্তার মধ্যে টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত যন্ত্রবৎ বিধিবদ্ধ আমলাটি মানবমঙ্গলের জন্য কোন কর্মপন্থা নির্ধারিত করে উঠতে পারে না। আন্তন চেখভের সাহিত্য রচনাকৌশলের ছায়ায় রচিত এই নাটক বিপ্রতীপ সত্তার দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তোলে একটি মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রশ্নের আকারে।

"অনিকেত অন্বেষণ" দিল্লির সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালকে আবর্তন করে রচিত হয়েছে। তুঘলকের শাসনকাল তাঁর সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে নানা বিদ্রোহের আগুনে অনবরত পুড়েছে। সুলতান কখনো তাকে দমন করছেন নির্মমভাবে, কখনো দ্রোহীকে করছেন ক্ষমা। অন্যতম বিদ্রোহী বাহাউদ্দিনের জন্য সুলতান-পত্নী স্বয়ং ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তুঘলক তাকে জবাব দিলেন "সস্তা অনুভূতির কথা বলোনা। সময় যদি না-কাটে তো হীরের মুকুটে হাত নেড়ে দেখো কিংবা আর ক'জন বাদী চাই বলো!" - এই উদ্ধৃতি যেন স্পষ্ট তীব্রতায় বুঝিয়ে দেয় ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা মানুষের মনোভাব। একইসাথে যখন তুঘলক মুদ্রা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করছেন এবং তামার মুদ্রা প্রচলন করছেন সেই সময়ে মুদ্রানীতির সাথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সম্পর্ককে দেখানোর চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। একই বিষয়বস্তু ও পেক্ষাপটে ভারতীয় নাট্যকার গিরিশ কারনাডের একটি উপন্যাস ও বহুল-মঞ্চায়িত নাটক রয়েছে, তবে সেলিম আল

দীনের রচিত নাটকটির অনন্যতা তার বিক্ষণী দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টিতে তিনি তাঁর স্বদেশে নব্য-তুঘলকদের দেখেছিলেন।

"সংবাদ-কার্টুন" নাটকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক নৈরাজ্যের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত বিভিন্ন ঘটনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, কালোটাকার দৌরাত্ম্য, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ভেজাল, রাজনৈতিক নেতাদের গুপ্তহত্যা, শাসকগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণবিহীনতা - এসবের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল নাটকটি। ঢাকা থিয়েটারের এটি ছিল একটি অসামান্য শক্তিশালী রাজনৈতিক মিউজিক্যাল কমেডি প্রযোজনা। নাটকের শুরুতেই একটি বিরাট আকারের কার্টুন উপস্থাপিত করা হয়, প্ল্যাকার্ড হাতে একজন অভিনেতা প্রবেশ করেন যাতে ঢাকা শহরের মানচিত্র আঁকা। অন্যদিক থেকে আসা একজন ঘোষক বলেন, "ঢাকা শহরের মানচিত্র নিজেই একটি স্লোগান - ঢাকা শহর ! জী হ্যাঁ, কালোবাজারি, চোরাকারবারির শহর - মুনাফাখোর, মজুদদারদের শহর - হাইজ্যাকের, ব্যাংক লুটেরাদের শহর - ঢাকা শহর ! ঢাক ঢাক - গুড় গুড় কি ? এ তো সত্যি কথা ! অবশ্য আমার মত নিরীহ মানুষেরাও এ শহরে থাকে। তাছাড়া আছে বেচারী মধ্যবিত্ত, ব্যর্থ প্রেমিক, হতাশ রাজনীতিক, গ্যাস্ট্রিকে ভোগা বুদ্ধিজীবী, জন্ডিসে ভোগা কবিকুল ! আয়তন পনেরো বর্গমাইল - লোক সংখ্যা বিশ লক্ষ। বিশ হাজার কেরানী, ছয়'শো হাইজ্যাকার, পাঁচশো নকলবাজ, তিনশো কালোবাজারি, ছয় হাজার ব্যবসায়ী, ছয় হাজার কসাই। জী, জী, কসাই এবং ব্যবসায়ী। দৈনিক তিনটি খুন, চারটি ধর্ষণ, পাঁচটি অপহরণ..."

নয়ের দশকে বিশ্বজুড়ে ভুবনায়নের বিপুল তরঙ্গে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের ভূখণ্ডে ভোগবাদের তীব্র হাতছানি সমাজের একাংশকে করে তুলেছিল বেপরোয়া দুর্নীতিপরায়ন এবং অসদুপায় জনগণের অর্থ লুণ্ঠনকারী। এদের কেউ রাজনৈতিকের ছদ্মবেশে, কেউ ব্যবসায়ীর ভোলে রাষ্ট্রব্যবস্থার চোখে ধুলো দিয়ে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে নির্বিচারে। তাদের এই দুর্দমনীয় লালসাকে ব্যাঙ্গের তীব্র কষাঘাতে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন তাঁর "মুনতাসির" নাটকে। সেখানে মুনতাসির এক সর্বভুক চরিত্র, যে নির্বিচার খাদ্যগ্রহণে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার পাকস্থলী অপারেশন করে দেখা যায় নানা অখাদ্য সে অকাতরে উদরস্থ করলেও হজম করে উঠতে পারেনি!

নাট্যকার সেলিম আল দীন এই পর্বে সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা অসঙ্গতি ও বিচ্যুতি, সভ্যতার স্খলন ইত্যাদিকে তার নাট্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। স্পষ্টত কোন দলীয় রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোকে গড়ে না-উঠলেও সামগ্রিকভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি প্রগতিবাদী রাজনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করা যেতেই পারে, যা একটি তৃতীয় বিশ্বের আর্থসামাজিক বাস্তবতার নিরিখে ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনের ভাবধারার প্রত্যক্ষ মতাদর্শগত ছায়ায় না-হলেও তার উপচ্ছায়া দ্বারা প্রভাবিত বলে নির্ধারণ করা যায়। সেলিম আল দীনের উল্লিখিত জীবনবৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায় তাঁর নাট্যকার সত্তার অগ্রগতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিবর্তন সমান্তরাল ও সমগতিতে অগ্রসরমান ছিল। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উত্তরাধিকার অন্যদিকে বাঙালির সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত জাতীয় চৈতন্যের সমন্বিত মূল্যবোধকে বিশ্বসভায় আন্তর্জাতিকমানে প্রতিষ্ঠা দিতে লোকায়ত জীবন থেকে চর্যা আহরণ করে সেলিম আল দীন তাঁর সৌন্দর্যদৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন, যা একাধারে স্বদেশমুখীন এবং বিশ্বমুখীন।

২০০৫-২০০৬ প্রায় দু' বছর ধরে সেলিম আল দীন লিখেছিলেন তাঁর 'ধাবমান' নাটকটি। সোমেশ্বরী নদীর পূর্বপাড়ের সাধুটিয়া গ্রামের নহবত ও তার নিঃসন্তান দ্বিতীয় স্ত্রী সুবতীর জীবনের নানা-ঘাত-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে এই নাটকের আখ্যানবিস্তার। একটি নিরীহ পশুর প্রতি বাৎসল্য আর আপন সন্তানের মতোই বিরল ভালোবাসা লালন থেকে তার অমোঘ মৃত্যুর এক মর্মান্তিক গাথা 'ধাবমান'। প্রতিবন্ধী এসাক স্বপ্নে দেখে বোবা ষাঁড় সোহরাবকে জবাই করে গ্রামবাসীকে ভোজ দিলে তবেই তার পা ভালো হয়ে যাবে। নহবত তার সন্তানতুল্য সোহরাবকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাড়িতে কসাই এলে সোহরাব দড়ি ছিঁড়ে পালায়। সকলে তাকে তাড়া করলে একজনকে হত্যা করে সে। এরপর আরো অনেক ঘটনা ঘটিয়ে মান্দিপল্লীতে আশ্রয় নেয় সোহরাব। সেই এলাকাটি গারো উপজাতিদের বাস। তারা সোহরাবকে দেবতার আসন দেয় এবং বিশ্বাস করে যে সোহরাব গারো এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। পরিস্থিতিক্রমে সেখান থেকেও পালিয়ে যায় সোহরাব এবং বর্ডারের কাছে গেলে বিএসএফ তাকে গুলি করে। রক্ত ঝরিয়ে পুনরায় মান্দিপল্লীতে ফিরে আসে। অন্যদিকে সোহরাবের খোঁজে বাঙালিরা ছুটে আসে মান্দিপাড়ায় - তাদের দেখে আবার পালায় সোহরাব। শেষপর্যন্ত প্রভুর বাড়িতে আশ্রয় নেয় কিন্তু এবার আর বাঁচার চেষ্টা করে না । কসাই তাকে জবাই করে। এইভাবে জীবনের পেছনে মৃত্যুর এবং মৃত্যু থেকে ধাবমান জীবনের এই বৈপরীত্যের মধ্যে দ্বান্দিক সত্যকে ধাবমান নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন।

'নিমজ্জন' নাটকে নাট্যকার দেখিয়েছেন পৃথিবীব্যাপী চলে আসা গণহত্যার ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত। প্রাচীন কাল, মধ্যযুগ আর আধুনিককালের সকল গণহত্যার বয়ান তিনি তুলে ধরেছেন অভিনব এক কাব্যিক অভিজ্ঞতায়। এই নাটকে আখ্যান বর্ণনার অন্যতম আশ্রয় হলেন রুগ্ন মৃত্যুপথযাত্রী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনৈক অধ্যাপককে দেখতে আসা এক আগন্তুক - যিনি সাধারণ রেডক্রস কর্মী হিসেবে ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে ধর্ষণ-হত্যা-এইডস-ম্যাডকাও ডিজিজ দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহস্রাব্দের আরো বহু ইতিহাস ও মিথের ঘটনাকে সমান্তরালে এনেছেন নাট্যকার। পৃথিবীর তাবৎ হত্যা ধর্ষণ আর অমানবিকতার কথামালা হাহাকারের গুঞ্জন নিয়ে এসে পড়েছে এই নাটকের অনুষঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের হত্যা কীর্তি পেরিয়ে ফ্রাঙ্কো, মিলেসোভিচ, জর্জ বুশের হত্যালীলা, খেলার উন্মাদনা, বহুজাতিক কোম্পানির ফ্যাশন শো, ক্যাটওয়াক, কম্পিউটার আধুনিকতার যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নাটকের আখ্যান।

২০০৬ সালে 'স্বর্ণবোয়াল' লেখেন সেলিম আল দীন। মাত্র ২০দিনে রচিত বর্ণনাত্মক ধারার এই নাটকটিতে রূপকথা থেকে 'স্বর্ণবোয়াল' চরিত্রটি উঠে এসেছে। কিন্তু নাটকের পরিণামে এসে মর্মান্তুদ বাস্তবতায় খুন হতে দেখা যায় তাকে। গল্পটি যেমন মূলত মাছ নিয়ে, নাট্যকারও তেমনি উপাখ্যানের কাহিনীকে ওলট-পালট করেছেন বড়শিতে গাঁথা মাছটির মতো। স্বর্ণবোয়াল শিকারের আকাঙ্ক্ষা নিকারিপাড়ার খলিশা মাঝির রক্ত থেকে প্রজন্মক্রমে তার সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জেলে জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, নানা প্রজাতির মৎস্যশিকারের কায়দা, জেলেপাড়ার নৈমিত্তিক জীবন, প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তর "স্বর্ণবোয়াল" নাটকে ফুটে ওঠে বিষয়ের গভীরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে।

২০০৭ সালে রচিত 'পুত্র' নাটকটি সেলিম আল দীনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ রচনা। মাত্র এক সপ্তাহেই নাটকটি লিখে ফেলেন তিনি। যমুনাপাড়ের এক মাইট্যাল দম্পতির পুত্রহারানোর বেদনাকে অপূর্ব ভঙ্গীমায় নাটকটিতে প্রকাশিত হয়েছে। 'পুত্র' নাটকের নামচরিত্র যে পুত্রসন্তান, বাবা-মা তার নাম রেখেছিলো মানিক; সে আমগাছের ডালে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। তাই তার শেষকৃত্য হয়নি, তাকে জানাজা ছাড়াই চিরনিদ্রায় মাটির গভীরে কবরে রেখে আসা হয়। এই সত্য সূত্রের অবলম্বনে নাট্যকার অনন্য স্বাতন্ত্রে ও সুনিপুণ বর্ণনায় গর্ভজ পুত্রের জন্য বাংলার পিতা-মাতার চিরকালীন অবিরাম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর পরিণতির জন্য পারস্পরিক দোষারোপকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। বিশ্বায়নের করাল গ্রাসে তৃতীয় বিশ্বের দেশীয় শ্রমনিবিড় শিল্পের সমূহ সর্বনাশ এই নাটকের বিষয়-উৎস।

নাট্যকার জীবনের প্রথমার্ধে সেলিম আল দীনের রচনায় বিশ্ব-পুঁজিবাদের আগ্রাসী চরিত্র এবং সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির সংকট প্রত্যক্ষ স্লোগানের মত যেমন প্রতিধ্বনিত হয়েছে, তাঁর নাট্যভাষাতেও ইউরোপীয় নাট্যরচনাশৈলীর ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি একটি স্বজাতীয় নাট্যনির্মাণশৈলী পুনরুদ্ধারের সচেতন চেষ্টায় তাঁর রচিত নাটকগুলিকে লোক-আঙ্গিকের অভিমুখ দিয়েছেন, সেইসাথে যুক্ত করেছেন সাহিত্যের সীমানা ভেঙে বিবিধ প্রণালীর মিশ্রন তথা দ্বৈতাদ্বৈত সংলাপের পদ্ধতি। এই পর্বের নাটকগুলিতে তাই সাবলটার্ন বা অন্ত্যজ ও প্রান্তিক মানুষের ভাষ্যে ও ভাবনায় প্রকাশিত হয়েছে সভ্যতার সংকটের মানচিত্র। সহস্রাব্দের সূত্রপাতকাল থেকে তাঁর রচনায় আরো একটি বাঁক এসে উপস্থিত হয়। ক্রমশই তিনি আখ্যানহীনতার দিকে যেন সচেতনভাবে সরে আসতে চাইছিলেন। শুধুমাত্র কিছু সংকেতকে অবলম্বন করে উন্মুক্ত নাট্যভাষায় বক্তব্যকে হাজির করতে চাইছিলেন। এবং সেই অর্থে দেখতে গেলে সার্থক সাম্যবাদী শিল্পের বৈশিষ্ট্য - যাতে প্রাদেশিকতা বা পশ্চাদপদতার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না এবং চিরায়ত ও লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে যা সকল মানবিক এবং ধ্রুবক - তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামী প্রয়াস থাকে, সেই সাম্যবাদী নাট্যসংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা দিতে যুগান্তরী ভূমিকা রেখেছেন। সেলিম আল দীন তাই একজন দার্শনিক-নাট্যকার যার চিন্তনের মূলে রয়েছে সাম্য-সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন।

বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির রেনেসাঁকাল গত শতকের ষাটের উত্তাল দশকে সেলিম আল দীনের যৌবনের গরিষ্ঠভাগ অতিবাহিত হয়েছে ঢাকায়। তাঁর শিক্ষা, মানস-গঠন ও জীবনদর্শনের মৌলিক উপাদানগুলির নির্মাণ প্রায় তখনই সম্পন্ন হয়। দেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তৎপরবর্তীকালের ঘটনাধারা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সামরিক শাসনজারী ও ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান, বাঙালির আত্মপরিচয়ের কৃত্রিম সংকট, লুম্পেন-বুর্জোয়া পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী আস্ফালন ইত্যাদি তাঁর জীবনভাবনা ও রচয়িতা-সত্তায় গভীর ও বিস্তর প্রভাব ফেলেছে। বাঙালির নিজস্ব নাট্যাঙ্গিক অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশৈলী নির্মাণে ব্রতী, উত্তর-ঔপনিবেশিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাণপুরুষ এই যশস্বী ব্যক্তিত্বের অকাল প্রয়াণ অপার-বাংলার নাট্য সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এ কথা এতদসংশ্লিষ্ট সকলেই খেদের সাথে স্বীকার করেন।

তথ্যসূত্র:

1. অরুণ সেন, সেলিম আল দীন নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র, ১ম-প্র, (বগুড়া : দুই বাংলার থিয়েটার প্রকাশন, ২০০০)।
2. আফসার আহমদ, মঞ্চের ট্রিলোজি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, গ্রন্থিক, ৫০ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।
3. আবুল মনসুর, শিল্পী, দর্শক, সমালোচক, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১০০০, ৫ ফাগুন, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।
4. একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ [১৯৬৩-১৯৭৬], সংকলন ও সম্পাদনা: মোবারক হোসেন, বাংলা একাডেমী, রমনা ঢাকা-১০০০, জুন-১৯৯৫ খৃষ্টাব্দ।
5. গোলাম শফিক, সেলিম আল দীন : রাষ্ট্রচিন্তা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, থিয়েটার, সম্পা: রামেন্দু মজুমদার , বাড়ি ১০৩, রোড ২৫এ, বনানী, ঢাকা, ৩৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মে ২০০৮ খৃষ্টাব্দ।
6. ঢাকা থিয়েটার উৎসব স্যুভেনিরে দলের নাট্যাদর্শ, 'শেকড়ের সন্ধানে', মোসাদ্দেক মিল্লাত ও সাইমন জাকারিয়া সম্পাদিত, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, (ঢাকা: ১৬ মার্চ ২০০২)।
7. বৈরাগ্য বসু, 'সাবঅলটার্ন সংস্কৃতি প্রসঙ্গ', অনিল আচার্য সম্পাদিত, অনুষ্টুপ, ত্রিংশতি বর্ষ: ১ম সংখ্যা, (কলকাতা: ১৯৯৫)।
8. মিল্টন বিশ্বাস, 'কিত্তনখোলার শিল্পভাষ্য', বাসুদেব ঘোষ সম্পাদিত, ধ্বন্যালোক, শারদ সংখ্যা, (ঢাকা: অক্টোবর ১৯৯৯ মার্চ ২০০০)।
9. রামেন্দু মজুমদার, 'সেলিম আল দীন: এক অসমাপ্ত মহাকাব্য', দৈনিক ভোরের কাগজ, (ঢাকা: ২৫ জানুয়ারি ২০০৮)।
10. লুৎফর রহমান , 'ব্রতচারী শিল্পী', সেলিম রেজা সেন্টু সম্পাদিত, দুই বাংলার থিয়েটার, ০২ বর্ষ: ০২ সংখ্যা, (বগুড়া: শকুন্তলা প্রকাশনী, ১৯৯৯)।
11. সত্য বন্দোপাধ্যায়, আমাদের থিয়েটার মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব, সম্পাদনা: শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নভেম্বর ১৯৯০ খৃষ্টাব্দ।
12. সাজেদুল আউয়াল, 'কালের কথক : সেলিম আল দীন', সেলিম আল দীন সম্পাদিত, থিয়েটার স্টাডিজ, ৮ম সংখ্যা, (ঢাকা: নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জুন-২০০১)।
13. সেলিম আল দীন, নিমজ্জন, ক্রান্তিক, ১৬৬ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৩ খৃষ্টাব্দ।
14. সেলিম আল দীন, সমকালীন নাট্যচর্চা বিষয়ে, সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ১, সম্পাদনা: সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রকাশকাল: ২০০৬।